ভূমিকা

সামাজিক অন্যায় অবিচারের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ভাবনার উত্থান নকশাল আন্দোলনের মূলে নিহিত রয়েছে। বিশ শতকের এই রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা বাঙালির ঐতিহ্যের গভীরেই বর্তমান। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক চেতনা বাংলার মানুষের মধ্যে নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সুতীব্র আকারে প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্তত বিভিন্ন সাহিত্যশাখা সেই সাক্ষ্যই বহন করে। ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে লিটারারি সোর্স একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র। তাই নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের উৎস সন্ধানে প্রয়াসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর উৎসমুখে যেমন রয়েছে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা তেমনি সেই চেতনার সাক্ষ্য বহনকারী বিভিন্ন সাহিত্যশাখা।

রাজনীতি অর্থে কোনো সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেওয়া আদতে রাজনৈতিক চিন্তা বিকাশের সূত্রকে প্রকারন্তরে অগ্রাহ্য করা হবে। 'পলিটিক্স' শব্দটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মাধ্যমে। গ্রীসে 'Polis' শব্দের অর্থ নগর। এই সূত্রে স্বীকার করতেই হয় নগরকেন্দ্রিক যাবতীয় বিষয়ই পলিটিক্স-এর মধ্যেই পড়ে। সেহেতু বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতির সীমাকে বিস্তৃত করে দেন দর্শন-অর্থনীতি-সমাজবিজ্ঞানের প্রাঙ্গনে পৌঁছে দিয়ে। ফলত যে কোনো বিষয়কেই রাজনৈতিক আখ্যা দেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। সমাজ পরিবর্তনের ধারা মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। কাল মার্কস জানান, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই মানুষের চেতনার স্রষ্টা। (ভূমিকা—Critique of Politial Economy II অনুবাদ N.I. Stone, ১৯০৪) ব্যক্তি মানুষ সমষ্টি মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোত। সমষ্টির অবস্থান পরিবর্তিত হয় উৎপাদন শক্তির পরিবর্তনের মাধ্যমে। আর সমাজ পরিবর্তন অনিবার্য। কারণ কোনো উৎপাদন শক্তি স্থায়ী নয়। সমাজবিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে আমাদের সামনে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আদিম সাম্যবাদী সাধারণ সমাজ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও ভোগরীতি ভিন্ন ভিন্ন। পাথরের অস্ত্র ব্যবহার আদিম সাধারণ সমাজের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থানকে নির্ণয় করেছে। একত্রে শ্রমদানের ফলে আহৃত উৎপাদন সম বন্টনের মাধ্যমে ভোগ্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে ধাতু অস্ত্র আবিষ্কারে শ্রমবিভাজন সুনির্দিষ্ট হয় উৎপাদিত দ্রব্য সমবন্টনের পরিবর্তনে শক্তিমানের ভোগ্য হয়ে ওঠে। দাস ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। আরও পরে উৎপাদনের শ্রীবৃদ্ধির কারণে শ্রমদানকারী মানুষকে দাসের মতো রাখা হল না। তাদের

অনেকটাই স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু শোষণ চলেছে পূর্বের মতোই। এই সমাজব্যবস্থা চিহ্নিত হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নামে। পরবর্তী কালে শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রম বিক্রির ধারণা কাজে লাগানো হল। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে শ্রম বিক্রির পদ্ধতি নতুন মাত্রায় শোষণকে প্রতিফলিত করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তার উৎসমূলে। এখানে প্রাপ্যের তুলনায় কম মূল্যে শ্রমিক শ্রেণি তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলত ভোগরীতি কেবল আঙ্গিক পরিবর্তন হল কিন্তু শোষণ অপরিবর্তিত রইল। এঙ্গেল্স জানান,—

> ক্রীতদাসত্ব যা সভ্যতায় তার চরমতম বিকাশলাভ করেছে সর্বপ্রথম সমাজের মধ্যে শোষক ও শোষিতের শ্রেণীর বিরাট বিভাগের প্রবর্তন করে। সভ্যতার যুগে বরাবর এই বিভাগ চলে এসেছে। প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য দাস-প্রথাই হ'লো শোষণের প্রথম রূপ। তারপর মধ্যযুগে আসে ভূমিদাস-প্রথা এবং বর্তমান যুগে মজুরির প্রথা। এই হ'লো সভ্যতার তিনটি বড় বড় যুগের বৈশিষ্ট্যমূলক দাসবৃত্তির তিনটি বড় বড় রূপ। এই রূপগুলির অপরিবর্তনীয় লক্ষণ হ'লো—হয় প্রকাশ্য দাসত্ব, নয়তো বর্তমান যুগের মতো ছদ্ম দাসত্ব।[১]

ছদ্ম দাসত্ব থেকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসেই গড়ে উঠলো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

সমাজ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার নানা রূপ আমরা লক্ষ্য করলাম। উনিশ শতকের ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে গড়ে ওঠার পূর্বেই মানুষের শ্রেণি অবস্থানজাত অত্যাচার নিপীড়নের অসহায়তা ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে সাধারণ মানুষকে। যার ফলশ্রুতি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। অসমীয়া ভাষার কথা সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার লেখায় পেলাম জমিদার শ্রেণির অত্যাচারের চিত্র। রাজনৈতিক বিচিত্র তল ভারতীয় নানা ভাষায় চিত্রিত হল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। গুজরাটে গোবর্ধনরাম মাধবরাম লিখলেন চারখণ্ডের উপন্যাস 'সরস্বতী চন্দ্র'। সমসাময়িক রাজনৈতিক চিত্র এখানে স্পষ্ট। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের মত সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় মারাঠি ভাষার লেখক হরিনারায়ণ আপ্টের 'আজচ' উপন্যাসে। এ ব্যাপারে উড়িষ্যাবাসীও পিছিয়ে থাকে নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাই শশীচন্দ্র দত্তের The Republic of Odissa : Annals from the Pages of Twenteeth Century (১৮৫৪)। আবার ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে আক্রমণ করে উনিশ শতকেই হিন্দি সাহিত্যে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র বিরুদ্ধাচারণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর 'ভারতের দুর্দশা' ও 'ভারত জননী'

নামক দুটি নাটক। দ্বিতীয়টি কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' নাটকের অনুবাদ। উনিশ শতকীয় ভারতীয় সাহিত্যিকরা কথাসাহিত্য, কাব্য, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় তাঁদের রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটালেন।

যদিও এর জন্য ভারতীয় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা এক ধরণের মূল্য অনেকদিন থেকেই দিয়ে আসছিল। উনিশ শতকের রাজনৈতিক চিন্তা বিকাশের সূত্রটি সেখানেই নিহিত। কালমার্ক্স ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন দেখেন নি। রাজনীতির ঝড়ঝাপটা এই সমাজব্যবস্থাকে ছুঁতে পারে না। (The Capital II voi. I, ৩৩৭-৩৩৯) সেই ব্যবস্থা পাল্টে গেল ইংরেজের ভারত আগমনে। পাল্টে গেলেও কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন এলো না। মোগল আমলে খাজনা দেওয়া প্রজা কর্তব্যের মধ্যে পড়লেও রাজকর্তব্য প্রজা-বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই খাজনায় ভোগবিলাস প্রকৃতপক্ষে প্রধান হয়ে উঠেছিল। বাণিজ্যের সঙ্গে গ্রামগুলির সম্পর্ক ছিলনা। ইংরেজি শাসন ব্যবস্থায় শিল্পের বিকাশ ও যাতায়াত মাধ্যমের উন্নতিতে পূর্বের পরিস্থিতি বদলে গেল। কোম্পানী শাসক হয়েই ভয়ঙ্কর শোষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। যার ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেই মন্বন্তরের পরে পূর্বের তুলনায় রাজস্ব আদায় অনেক বেশি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বদরুদ্দীণ উমর জানান,

> নির্মম অত্যাচার ও লুণ্ঠনের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ করার ফলে সমগ্র কৃষি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা নিরসনের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কয়েকদফা রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করার পর শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ সালে বাঙলাদেশে প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।[৫]

শোষণের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে ইংরেজরা জমিদারদের হাতিয়ার করলেন, অন্তত লর্ড কর্নওয়ালিসের বক্তব্যে (Land Problems in India : Radhakamal Mukherjee গ্রন্থে বক্তব্যটি রয়েছে) তা প্রমাণিত। শোষণের কৌশল ও প্রতিফলন মননশীল মানুষরা বুঝতে দেরি করেন নি। রমেশ দত্ত প্রতিক্রিয়া জানালেন The Economic History of India গ্রন্থে। এছাড়া ইয়ংহাস্‌ব্যান্ড লিখলেন Transactions in India। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করতে হয় সুব্রামনিয়া আয়ার, গোখেল, ডি.ই ওয়াচা, দাদাভাই নৌরোজী, যোশী প্রমুখের নাম।

উনিশ শতকে বাঙলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনেকটা সীমায়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৃত্তে। বদরুদ্দীন উমর অনিল শীলের 'The Emergence of Indian Nationalism' গ্রন্থ থেকে তথ্য উদ্ধার করে দেখালেন

১৮৮৬ সালের একটি কংগ্রেস প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,

> ভোটাধিকার শুধু তাদেরই থাকবে যারা শিক্ষিত ও সম্পত্তির মালিক। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই বহাল ছিলো, যদিও তাতে সম্পত্তির মালিকানার পরিমাণ কমিয়ে এনে ছয় আনা করদাতা পর্যন্ত ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হয়েছিলো।[৩]

এই সময় তৎকালীন বহু শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। একদিকে ১৮২৯ সালে কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি সমর্থন করতে পারছেন না, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় উম্মিলিত। বঙ্কিম একদিকে লিখেছেন 'বঙ্গদেশে কৃষক', যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থন রয়েছে প্রকারান্তরে, –

> আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদন করিও না। ১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেইদিন সে পরামর্শ দেব এবং ইংরেজরাও এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্টজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাই যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যতদূর প্রতিকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, "যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্দ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্ত্তব্য।" আমরা তাহাই চাই।[৪]

অথচ প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুদিকগুলি স্পষ্টভাবে বললেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভারতীয় উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে তিনি সরব হলেও ইংরেজের প্রতি নমনীয়।

এবং এক ধরনের মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি জমিদার ও প্রজা উভয়ের উন্নতি চাইলেন। কিন্তু তার পথ নির্দেশ নেই। প্রাবন্ধিক ইংরেজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ভ্রান্তি দেখেছেন, এড়িয়ে গেছেন সচেতন শোষণ প্রক্রিয়াকে। সমাজ বদলের সূত্রে তাঁর আলোচনা লক্ষণীয়।—

> প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত, কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন, মাথট, পার্ব্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালে পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্য বিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না, যাঁহারা মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত।...। মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দুরাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে কর সংগ্রহের গ্রাহক নিযুক্ত করিতেন। তাহার এক এক ব্যক্তি কর সংগ্রহের কনট্রাক্টর হইলেন। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমিদারীর সৃষ্টি এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। এই কনট্রাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।[৫]

ইংরেজদের অপরাধকে 'ভ্রম' রূপে চিহ্নিত করবার জন্য প্রাচীন হিন্দুরাজ্য ও মুসলমান রাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা করেন। হিন্দুরাজ্য প্রজাপীড়নহীন, মুসলমান রাজ্যের শাসক 'রাজ্যশাসনে সুপারগ' নন। অথচ পুরোনো প্রথাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেও ইংরেজরা নির্দোষ। প্রজাদের 'দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরেজদিগের ইচ্ছার ত্রুটি ছিলনা'। তাদের 'ভ্রমে' কৃষকরা নিপীড়িত। কৃষকদের দুঃখে ব্যথিত তিনি। দুঃখের কারণ জমিদার ও ইংরেজ— প্রাবন্ধিক তার প্রমাণও রাখেন। বলেন—

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী। জমীদারেরা কস্মিন্‌কালে কেহ নহেন— কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরেজরাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র কস্মিন্‌কালে ফিরিবে না, ইংরেজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী। কেন না, এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী। কর্ণওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত-পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন— জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয় সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর-জেনেরল যখন যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজনা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

বিধিবদ্ধ করিবেন আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরেজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ লিখিলেন, "যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।" এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কাম্বেল নামক একজন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী লিখিলেন, এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট গ্রাম্য ভূস্বামী (প্রজা) দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গীকারমত কর্ম্ম করেন নাই। বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্ব্বলকে আরও দুর্ব্বল করিলেন, বলবানকে আরও বলবান্ করিলেন। ... ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিলনা, কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।[৬]

'তৃতীয় কুগ্রহ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ব্যাখ্যাটি তাৎপর্যবহ। ইংরেজ ব্যবসার করাণে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম রাখতে চেয়েছে, সেহেতু তাদের রাজত্বে গ্রামীণ ব্যবস্থায় সামন্তপ্রথার মধ্যেও বুর্জোয়াতান্ত্রিক পথটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কৃষকদের সুপরিকল্পিত ভাবে মজুরে পরিণত করা হল। সম্পত্তির অধিকার তাদের রইল না। আরও কয়েকটি আইনে সেই হৃতসর্বস্ব মানুষগুলি তলানিতে গিয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য হল। বঙ্কিম সে কথাও তুলে ধরলেন।—

> এই ১৮১২ সালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত "পঞ্চম।" যদি কেহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে "পঞ্চম" করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই।
>
> "ক্রোক" কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি সন ১৮১২ সালের ৫ আইনও ক্রোকের প্রথম আইন। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন সেই বৎসর ক্রোকের প্রথম আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল। জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরেজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন, অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইন-সঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।
>
> পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কায়িমী প্রজাদিগকেও নিরিখের বিবাদস্থলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।
>
> তাহার পর সন ১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ সালে বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড ক্যানিং হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণই শেষ। তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপিমাত্র। ১৮৫৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে-সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায় এই আইন বা অন্য কোন আইন দ্বারা হয় নাই। ক্রোক, লুঠ, বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ প্রজার খাজনা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের

> সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে। তথাপি এইটুকুমাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী,স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি করিতেছেন। আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে-সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?[৭]

এর পরেওবঙ্কিম ইংরেজদের অপরাধকে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মনে পড়বে পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল আবেদন-নিবেদন নীতির মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের সুপ্রতিষ্ঠা দান ও উভয়ের মহিমাকীর্তন।

> ইচ্ছাপুর্ব্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধিসকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।... শাসনদক্ষ ইংরেজরা কি ইহার কিছু সুবিধা করিতে পারেন না? যদি না পারেন তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন? যদি পারেন তবে মুখ্য কর্তব্যসাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন-হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি— তাঁহাদের মঙ্গল হউক, ইংরেজরাজ্য অক্ষয় হউক— তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।[৮]

সেই সময় উচ্চবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি কৃষকদের সমস্যা বুঝতে পারেন নি তা নয়, ব্যথাও পেয়েছেন, কিন্তু স্পষ্ট বিরোধিতার পরিবর্তে আবেদন-নিবেদনের পথে হেঁটেছেন। তা নেপথ্য কারণ অবশ্য একই সঙ্গে শ্রেণি অবস্থানজাত ও ইংরেজের কোপানল থেকে অব্যাহতি। আমরা যদি তৎকালীন শিক্ষিতের কাছ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিবর্তনের কথা পেতাম তাহলে পরবর্তীকালে কৃষকদের লাঞ্ছিত ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকারে বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে একটা আন্দোলনে রূপ পেতনা। নকশাল আন্দোলনের উৎসমূলে যে নিপীড়ন অত্যাচারের বিকৃত ছবি রয়েছে তার প্রেক্ষাপট রয়েছে যুগযুগান্তরে ভারতীয় ইতিহাসে। সেই ইতিহাসে

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দায়বদ্ধতা এড়ানো যায় না। তাঁদের স্বদেশপ্রেম সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বিরোধিতায় নয়, রয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনা উদ্বোধনে। ফলত তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমকালিন ইংরেজ ও জমিদারদের যৌথ অত্যাচার নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির পরিবর্তে ইতিহাসে দ্বারস্থ হয়েছেন। দীনবন্ধু মিত্রের মতো কয়েক জন নীলদর্পণের মতো গুটি কয়েক সাহিত্য সৃজন করেছেন। বেশির ভাগ সাহিত্যিক সেই স্পর্ধা দেখানোর পরিবর্তে ইতিহাসের প্রতীকে স্বদেশপ্রেমের ছবি আঁকলেন। যদিবা চন্দ্রশেখর উপন্যাসে অদূর অতীত মিরকাশিমের সময়কে কেন্দ্র করে বঙ্কিম দেশপ্রেমের কথা নিয়ে এলেন, কিন্তু স্পষ্টত সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ কী পাওয়া গেল? সত্যিকারের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপন্যাস প্রথম লিখলেন শরৎচন্দ্র। 'পথের দাবী' প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী উপন্যাস।

বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথমপর্ব থেকেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেশ বর্তমান ছিলো। সাহিত্য ও রাজনীতির অহিনকুল সম্পর্কে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা প্রেক্ষিতটিকে বিস্মৃত হন। প্রতিটি ব্যক্তিমানস বিভিন্ন সূত্রে সমসময় দ্বারা কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত। লেখকের শ্রেণি অবস্থান অনেকটাই নির্ধারণ করে রাষ্ট্রনীতির কোনো অংশের সমর্থন ও কোনো অংশের বিরুদ্ধাচারণ। যার ফলে গড়ে ওঠে রাজনীতি বিষয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ। এ কেবল বাংলায় নয়, বিশ্বসাহিত্যেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪১১ সালে পেলোপনেসীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গ্রিক নাটককার আরিস্তোফেনিস লেখেন Lysistrata। অ্যারিস্তোফেনিস সহ সেই সময় বহু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যুদ্ধকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দেখালেন লিসিস্ত্রাতা নামে এক আথেশনীয় যুবতী যুদ্ধ বন্ধের জন্য স্বামীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হবেন না। শুধু তিনিই নন আথেমোর প্রতিটি মহিলা এই ঘোষণা করেন। উপন্যাসে স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'ট্যালিসম্যান', চালর্স ডিকেন্সের 'এ টেল অফ টু সিন্টিজ', যা ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা। বাঙলা উপন্যাসের উৎস মূলে পৌঁছলে একথা স্বীকার করতেই হয়, উনিশ শতকের রচনাকার আত্ম অন্বেষণের পরাকাষ্ঠা করেছিলেন অতীত চারণাকেই। অতীতের রাজনীতি সমসাময়িক দেশপ্রেমের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে উপস্থাপিত হল উপন্যাসে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান—

> ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) দ্বারা নিশ্চিতভাবে সূচিত হইয়াছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর মধ্যে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই দুইটি আখ্যান সন্নিবিষ্ট। উহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক উপন্যাস-জাতীয় রচনার সাধারণ আঙ্গিক ও মূল সুর প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী তাহা নিঃসন্দেহে দাবি করা

যাইতে পারে।

'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'-এ ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে কিছুটা কাল্পনিক ও কিছুটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনে বিন্যস্ত করিয়া তাহাদের ইতিহাসের অজ্ঞাত মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চমকপ্রদ ঘটনা-পরিণতি দেখান হইয়াছে। শিবজী, আরংজেব, শাহজাহান, রোসিনারা, জয়সিংহ, রামদাস স্বামী ইহারা সকলেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র; এবং উপন্যাসে বর্ণিত তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও সাধারণভাবে সত্যানুগামী। কিন্তু এই সাধারণ সত্য কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে কিছু কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে যাহাতে ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা ও কল্পনারসের সিদ্ধি যুগপৎ সম্পাদিত হইয়াছে। আরংজেব দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়াছিলেন ও এই অভিযানে শিবজীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিয়াছিল ইহা সত্য ঘটনা। শিবজীর রণনীতি, তাঁহার সন্ধি-বিগ্রহের পিছনে কোন নীতিগত আদর্শের পরিবর্তে আত্মশক্তিবৃদ্ধির একনিষ্ঠ প্রেরণা, জয়সিংহের নিকট তাঁহার সাময়িক পরাভব, দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার, ও দিল্লীতে আরংজেবের কপট ব্যবহারে তাঁহার আনুগত্য-বর্জন—এ সমস্তই ইতিহাস-সমর্থিত যথার্থ ব্যাপার।[৯]

লক্ষণীয় 'আত্মশক্তিবৃদ্ধির এক নিষ্ঠ প্রেরণা' শব্দাবলী। উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপন্যাস রচনার অদূর ভবিষ্যতে ( ) হিন্দুমেলা শুরু হয়। তার কার্যকলাপেও এই বিষয়টি প্রকট ছিল। শুধু তাই নয়, হিন্দু জাতীয়তাবাদ যে ভাবে বাঙলায় প্রভাব ফেলেছিল তার সূত্রেও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে হিন্দুরাজাদের গৌরবগাথা চিত্রায়ণের আগ্রহ প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাম্রাজাবাদ বিরোধিতার ইতিহাস ইংরেজ তখনও পর্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। কৃষক আন্দোলন সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি শিক্ষিত মানুষদের একটা বড় অংশকে নিষ্ক্রিয় বা বিরূপ করেছিল। ফলে উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাস এবং মূলত হিন্দুরাজাদের বীরত্বের ইতিহাসে সীমায়িত থেকেছে অধিকাংশত। সমকালীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সরব হওয়ার পরিবর্তে অতীত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ে মগ্ন থাকলেন। একই সঙ্গে উনিশ শতকীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন ব্যক্তির চারিত্রিক মহত্ত্ব উদ্বোধনের প্রয়াসও কোন কোন উপন্যাসে দেখাযায়। সমকালীন সমাজে যে রাজনৈতিক রূপ মূর্তি পাচ্ছিল তার ফলে উপন্যাসে রাজনীতি অতীত দিনের বীরত্ব ও মানবতাকে কেন্দ্র করেই রূপ লাভ করে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের উপন্যাসের বিশ্লেষণে বিষয়গুলির সানুপঙ্খ বিশ্লেষণে

প্রয়াস পেলেন।—

> ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই প্রাণরহস্যটি নিজ সহজ ঔচিত্যবোধ ও ইতিহাসজ্ঞানের সাহায্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-বিন্যাস-পদ্ধতি, পার্বত্যযুদ্ধ পরিচালনা, শিবজীর শাসন-ব্যবস্থা, আরংজেবের কূটনীতি, জয়সিংহের প্রতি তাঁহার বিষপ্রয়োগের নির্দেশ ও তাঁহার পুত্রের নিকট কপট পত্রপ্রেরণ প্রভৃতির ইতিহাস-তথ্য তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই ইতিহাস-তথ্য-পরিবেশনের শিথিল গ্রন্থনের মধ্যে তিনি যে মানবচরিত্রজ্ঞান ও জীবনসত্যের দৃঢ়তর গ্রন্থি সংযোজনা করিয়া আকস্মিক ঘটনাকে মনস্তত্ত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব ও মৌলিকতা। শিবজীর চরিত্র, সৈনিকদের মধ্যে তাঁহার পুরস্কার-বিতরণের নীতি, জাতির অভ্যুদয়কালে দেশদ্রোহীর মধ্যেও দেশাত্মবোধ ও চরিত্র-মহিমার লুপ্তাবশেষের অস্তিত্ব, স্ত্রীজাতির নৈসর্গিক সেবাপরায়ণতা ও আর্তের প্রতি মমতাবোধ, অপরাধী সেনাটিকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে রত হওয়ার মধ্যে শিবজীর, নিগূঢ় অভিপ্রায়, জয়সিংহের প্রতি শিবজীর উদারনৈতিক আবেদন, শাহজাহানের খেদপূর্ণ, আত্মচিন্তন, আরংজেবের অন্তর-রহস্য-উদ্‌ঘটক স্বগতোক্তি—এই সবই তাঁহার মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়।
>
> ভূদেবের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর যতটা হউক বা না হউক, রমেশচন্দ্রের উপর উহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শিবজীর পার্বত্য-যুদ্ধ-বর্ণনা ও জয়সিংহের নিকট তাঁহার উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেমাত্মক আবেদন রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' উপন্যাসটিকে গভীরভাবে, সময় সময় আক্ষরিকভাবেও প্রভাবিত করিয়াছে। যে সরস মন্তব্য ও পাঠকের সরাসরি সম্বোধন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্থাপনের হেতু হইয়াছে ও পাঠককে এই নূতন ধরনের সাহিত্যের রসগ্রহণে সহায়তা করিয়াছে তাহারও প্রথম সূচনা ভূদেবে দেখা যায়।[১০]

স্বদেশ কল্যাণ ও গৌরবগাথা প্রচারের উদ্দেশ্যে অতীত পটভূমিতে বিচরণ করতে গিয়ে নবজাগ্রত কল্পনা বিলাসে বহু উপন্যাসে প্রেম গাথা প্রাধান্য পেয়ে গেল। তারই মাঝে মাঝে কয়েকটি উপন্যাসে জাতীয়তা বিলাসের চিত্রণ মুখ্য হয়ে ওঠে।—

বিনোদবিহারী গোস্বামী প্রণীত 'পূর্ণশশী' (১৮৭৫) কাশ্মীরের

রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহের আখ্যান। ললিতমোহন ঘোষ প্রণীত 'অচলবাসিনী' (১৮৭৫) একজন হিন্দু দুর্গাধ্যক্ষের সহিত একটি মুসলমান মহিলার বিবাহবর্ণনা। হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) কাছাড়ের ইতিহাস-মূলক গল্প, নবদ্বীপের রাজা কর্তৃক কাছাড় আক্রমণ ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহের বিবরণ। 'চন্দ্রকেতু' (১৮৭৭) কেদারনাথ চক্রবর্তী প্রণীত— ইহার ঐতিহাসিকতা অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া মনে হয়; যে জাতি তাহার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহার উন্নতি অসম্ভব— অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের এই উক্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত; ইহার উপাখ্যানভাগ বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গবিজয় ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর গোরাচাঁদ নামক একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্তৃক বঙ্গের কিয়দংশের পুনরুদ্ধার। রাখালদাস গাঙ্গুলীর 'পাষাণময়ী' (১৮৭৯) আলিবর্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে বর্গী আক্রমণের বর্ণনার সহিত মিশ্রিত প্রেম-কাহিনি। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'রাজকুমারী' (১৮৮০) বিক্রমপুরের একজন হিন্দু রাজার সহিত মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরবাসী একজন অনার্য রাজার যুদ্ধ-কাহিনী। হেমচন্দ্র বসু প্রণীত 'মিলন-কানন' (১৮৮২) সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটি প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা— জাহাঙ্গীর বুন্দির রাজকন্যার প্রেমপ্রার্থী ছিলেন; এই রাজকন্যা রাজ্যের প্রধান সেনাপতির প্রতি প্রণয়াসক্তা ছিলেন; অবশেষে নূরজাহানের প্রভাবে জাহাঙ্গীরের বিরতি ও প্রেমিকযুগলের মিলন— ইহাই 'মিলন-কাননের' বর্ণনীয় বস্তু। নীলরতন রায়চৌধুরীর 'যাবনিক পরাক্রম' (১৮৮১) পেশোয়ার দেশে হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্কিত প্রেমের বিবরণ।[১১]

এই সমস্ত উপন্যাসের সার্বিক বিশ্লেষণ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাৎপর্যময় দৃষ্টিভঙ্গিতে রাখেন।—

> ইহারা যুদ্ধ, ধর্মবিরোধ ও রাজনৈতিক ঘটনা লইয়াই ব্যস্ত। এই সমস্ত প্রবল বিক্ষোভ সাধারণ মানুষের জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহার ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ বিপ্লব আনয়ন করে, কিরূপ প্রবল বন্যার বেগে তাহার সাংসারিক সুখ-দুঃখের উপর বহিয়া যায়, তাহার কোনই নিদর্শন নাই। সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে একটি প্রধান গুণ তাহা ইহাদের মধ্যে একেবারেই দুর্লভ। তারপর ইহাদের ঐতিহাসিক

> উপাখ্যানগুলিও প্রায় সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবাস্তব; ইহাদের ইতিহাসের মধ্যেও যথেষ্ট মায়া ইন্দ্রজালের অবসর আছে। কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহ; একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্তৃক বঙ্গদেশ-জয়—এই সমস্ত গল্প যেন রূপকথার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসের কঠোর দিবালোক অপেক্ষা কল্পলোকের রঙ্গীন আলোই যেন ইহাদের প্রকৃতির অধিকতর অনুগামী।
>
> অপর কয়েকটি উপাখ্যান প্রকৃত ইতিহাস নহে, সম্ভাবিত ইতিহাসের কাল্পনিক রাজ্য হইতে গৃহীত, অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে,—যাহা ঘটিতে পারিত, যাহা ঘটা অসম্ভব ছিল না, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত; নবদ্বীপের রাজার কাছাড়-আক্রমণ বা বিক্রমপুরের রাজার সহিত পূর্বদেশবাসী কোন অনার্য রাজার যুদ্ধ এই অনিশ্চিত, কাল্পনিক বা অজ্ঞাত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। এই বিষয়েও প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত ইহাদের প্রভেদ বেশ সুনির্দিষ্ট। স্কট বা অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির। তাঁহারা সর্বজন-বিদিত, সুপরিচিত ঐতিহাসিক আখ্যানগুলিকেই আপনাদের উপন্যাসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। ক্রুসেড, স্যাক্সন ও নর্মান্‌দের পরস্পর দ্বেষ ও জাতিবিরোধ; রাজপক্ষ ও পার্লিয়ামেন্ট-পক্ষীয়দের দ্বন্দ্ব-কাহিনী; বার্গাণ্ডির ডিউক চার্লসের সহিত ফ্রান্সের রাজা একাদশ লুই-এর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনাসমূহই তাঁহাদের উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে।[১২]

রাজনৈতিক উপন্যাস না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আছে। শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল জানান,—

> স্বদেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম বা দেশভক্তি উদ্রেক করাইবার জন্য রাজসিংহ (১৮৮২ ও বড় আকারে ১৮৯৩ সনে), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) প্রকাশিত করিলেন।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত রাজনৈতিক বীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসে। গোরাকে ধর্মীয় ও সংস্কারবন্ধন থেকে উত্তীর্ণ করে কল্যাণকারী সেবক করতে চেয়েছেন। তার সংস্কারবদ্ধতা, ইংরেজবিদ্বেষ, হিন্দু সভ্যতা ও ধর্মের

অনুসন্ধান, স্বদেশীযুগের উন্মেষপর্বের যুবচেতনার বৈশিষ্ট্য।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিদেশী দ্রব্য বর্জনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের পটভূমি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। যদিও অতীন-এলার মনস্তাত্ত্বিক সংকটের চিত্রও প্রাধান্য পেল। এই দুটি উপন্যাসের উৎসমূল রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল অন্বেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে।—

> কুষ্ঠিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আমার তাঁতের কারখানার ইতিহাস যদি কোনদিন জানতে পাও তো দেখতে পাবে, ওই তাঁতের সুতো ধরে আমি সর্বনাশের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতেও ইতস্তত করি নি। সুতো সরবরাহ করে যাঁরা আমাকে ঠকিয়েছিলেন, তাঁরা আমারই দেশের লোক; স্বদেশীয়ানাকে মূলধন করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা।[১৪]

প্রশান্তকুমার পাল স্পষ্টতই বলেন,

> ঘরে বাইরে (১৩২৩) ও চার অধ্যায় (১৩৪১) উপন্যাসে স্বদেশিয়ানার অন্তরালবর্তী যে বিকৃতির ছবি তিনি এঁকেছিলেন, সেটি তাঁরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ।[১৫]

যে রবীন্দ্রনাথ তাঁতের কারখানা করে তিনিই যখন এমন ঘরে বাইরে, চারঅধ্যায় লেখেন তখন মনে হয় শুধু ব্যক্তিগত কারণেই কি দুটি উপন্যাসের জন্ম! ইংরেজদের বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বদেশী বুর্জোয়াদের একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্মের প্রয়োজন ছিল। কারণ বুর্জোয়ারা ইংরেজদের কাছ থেকে কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল না। সেই কারণেই বিদেশী দ্রব্য বর্জনের উশকানি তারা দিতে লাগলো এবং অর্থকরী সহযোগিতাও করতে থাকে। অথচ এতদিন ইংরেজদের সঙ্গে স্বদেশী বুর্জোয়াদের সখ্যতাই ছিল। (বিপানচন্দ্র Mordern India) রবীন্দ্রনাথের মতো রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি কি এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন নি!

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক সচেতন কথাসাহিত্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যার প্রয়াস পান স্বস্তি মণ্ডল।—

> এর আগে যে উপন্যাসগুলি রাজনৈতিক উপন্যাস অভিধা পেয়েছে অর্থাৎ ''আনন্দমঠ'', ''ঘরে বাইরে'', ''চার অধ্যায়''— ইত্যাদিকেও রাজনৈতিক উপন্যাস বলার প্রবণতাও যথার্থ মনে হয় না। ''আনন্দমঠে'' সন্ন্যাসী বিদ্রোহের, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, দেশাত্মবোধক মনোভাব ইত্যাদি আছে। পরবর্তীকালে প্রথমযুগের দেশপ্রেমিকের কাছে ''আনন্দমঠ'' 'গীতা সদৃশ' ছিল। কিন্তু

LIBRARY
NBU, DARJEELING
271092
07 JUN 2014

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস করতে চান নি।

পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন, বিলিতি দ্রব্য বর্জন ও সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা স্পষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র', 'একরাত্রি' প্রভৃতি ছোটগল্পে, ''ঘরে বাইরে'', ''চার অধ্যায়'' ও ''মালঞ্চ'' উপন্যাসেও অল্পবিস্তর রাজনৈতিক উত্তেজনা, স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব মেনে নেওয়ার ঘটনা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল না এবং রাজনৈতিক উপন্যাস তৈরী করার মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের কোনদিনই ছিল না। ''ঘরে বাইরে''র মূল বক্তব্য নিহিত আছে অন্যত্র— বিমলা নিখিলেশের দাম্পত্য সমস্যাকে অন্তর্বিশ্লেষণের সাহায্যে একটা গভীর জীবনসত্যজাত উপলব্ধির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ''চার অধ্যায়'' তাঁর মতে বিপ্লবী উপন্যাস নয়, প্রেমের উপন্যাস। এই দুটি উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশে যায় নি; বরং ভারবহ করেছে। উপন্যাস হিসেবে ''ঘরে বাইরে'' বা ''চার অধ্যায়'' বিশেষধারার সূচক হলেও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে উপন্যাস দুটিতে রাজনৈতিক পটভূমি সমান্তরাল পথ নিয়েছে। ''ঘরে বাইরে'' তে সন্দীপকে দেশসেবক না করলেই বরং যেন ভালো হোতো এবং তাতে মূল সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠে মানব-রহস্যকে স্বরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করতো। ''মালঞ্চে'' সরলার আকস্মিকভাবে দেশের কাজে সাড়া দেওয়া, হঠাৎই ফিরে আসা; রমেন চরিত্রের মুখে সন্দীপ সদৃশ রাজনৈতিক ভাবালুতার প্রকাশ যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রের কথা সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা গেল। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের সদস্য হলেও অনেক ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল। চৌরীচৌরার ঘটনায় মহাত্মাগান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রতিক্রিয়া জানান। প্রসঙ্গত প্রতিয়াটি স্মরণযোগ্য—

> গোটা কতক কনস্টেবলকে Infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে— সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার

> রক্ত কমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে? ...non Violence খুব noble idia কিন্তু Achievement of freedom is nobler- hundred times nobler [১৭]

তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস তাই সশস্ত্র সংগ্রামের চিত্রে সমৃদ্ধ। কোন কোন সমালোচক অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।—

> শরৎচন্দ্র বিপ্লবীজীবনের বিচিত্র লোমহর্ষক কাহিনীর উত্তেজনায় বাঙালী পাঠককে বিস্মিত করেছেন। "পথের দাবী" উপন্যাসটি রাজরোষে বাজেয়াপ্ত করায় লেখকের দেশপ্রীতি, রাজনৈতিক মতামত নিয়ে খুব হৈ-চৈ করাও হয়েছিল। সাংঘাতিক সক্রিয় রাজনৈতিক উপন্যাস বলে পরিচিতি পেয়েছিল "পথের দাবী"। কিন্তু উপন্যাসে রাজনীতির ভূমিকা যতটা আবেগপ্রসূত কল্পনা দিয়ে গড়া, ততটা সজীব বাস্তব সত্য তাতে নেই। বিপ্লবাত্মক ঘটনার পাশে পাশে রোমান্টিক প্রেমকাহিনী অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। [১৮]

অথচ ইতিপূবে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থনে সরব হয়ে কেউ উপন্যাস লিখলেন না। শরৎচন্দ্র দলিল নয়, উপন্যাস লিখেছেন। কল্পনার পাশাপাশি বাস্তবতাও কতটা রয়েছে সে সূত্রও আমরা পাই শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যে। তিনি জানান, পথের দাবী উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্রটি বাস্তবসম্মত। বাস্তবিক কয়েকজন সংগ্রামীর চারিত্রিক গুণের সমন্বয়ে চরিত্রটির নির্মাণ।—

> দুর্জয় সাহস, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অসীম স্নেহ-প্রবণতা ও ক্ষমাশীলতা— এইগুলি নিয়েছেন যতীন মুখার্জির জীবন থেকে, ছদ্মবেশধারণের অসাধারণ নিপুণতা ও গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছেন ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে, পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়ান ও বৈপ্লবিক কেন্দ্রসংগঠনের দিকটা নিয়েছেন রাসবিহারী বসু ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (এম.এন.রায়) জীবন থেকে। নানা দেশের নানা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারকনাথ দাস প্রভৃতির জীবন থেকে, দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলভার ছোঁড়ার দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজনের ছাপ আছে। [১৯]

এই প্রসঙ্গে 'পথের দাবী' উপন্যাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যথাক্রমে দু'টি পত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।... আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম— আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম— একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র— তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়।... শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হ'লে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? তা বলিনে— শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে। রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না। এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তা হলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হ'ত— কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে— দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই-অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরাজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্য তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য— আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে, সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে

দেওয়া হয়।

ইতি—২৭ শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২৩৯)

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা- হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা। কিন্তু সে কিছু নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে, সে সম্বন্ধে আমার দু একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন, ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ-যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙ্গলা ভাষায় এ-ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন, এ-দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দু'দিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক। এ আমার

ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতেই হবে– তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি। কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে, এ-সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয়, তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্য হয়, তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ, ছানা, মাখন পায় না ব'লে, কিংবা মুসলমান কয়েদীরা মহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে আমরা দুর্গোৎসবের পয়সা পাই না কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি। কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা উচিত ব'লে মনে করি তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্যসেবাটাই এই ধরনের। যা উচিত মনে করেছি, তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ-আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজ রাজশক্তির এ-বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশন যদি থাকে পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেষ্ট করার জাস্টিফিকেশনও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ ক'রে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতা আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এ-বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই। সেই আমার সান্ত্বনা হ'ত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের যদি কোন ময়লা আমার থাকতো, আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে, সামর্থ্যে, সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিন ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশত এ-পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।

ইতি ২ রা ফাল্গুন, ১৩৩৩
সেবক- শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কেবল রাজনৈতিক চেতনা জাতীয়তাবাদী রূপ নিয়েই প্রকাশ পায় নি, সামন্ততান্ত্রিক বিকৃত রূপের ছবি ও উঠে এল তাঁর উপন্যাসে।—

> কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলিয়া শরৎচন্দ্র জনসাধারণের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রমিকদের দাবী তিনি যেমন 'পথের দাবী' উপন্যাসে সমর্থন করিয়াছিলেন, কৃষক সমাজের অধিকারও তিনি 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে ও 'মহেশ' গল্পে স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বরাজের কথা তখন অনেকে বলিতে শুরু করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রও এই অর্থনৈতিক স্বরাজের দাবী সমর্থন করিয়াছিলেন। 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয়ের সময় অনেকেই বলিষ্ঠ ও বিদ্রোহী কৃষক-সমাজের রূপ দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।[২০]

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের অন্য একটি দিক লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

জমিদারী বিলোপ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নতুন মনোভাব ও আদর্শ কর্মীদের মনে এ-সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল, শরৎচন্দ্রের কাছে সেই মনোভাব ও আদর্শ উৎসাহ পেতে লাগল। শত শত কর্মী প্রতি সপ্তাহে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করতে লাগলেন এবং নতুন আদর্শ ও আলোকের প্রেরণা লাভ করতে লাগলেন।... এই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে হাওড়া-শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, সন্তোষকুমার মিত্র, ডাঃ সুবোধ বসু এই বৈঠকগুলিতে যোগদান করেছিলেন। ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। আর ছিলুম আমরা কয়েকজন তাঁর নিত্যসঙ্গী— আমি, প্রবোধ বসু এবং শিবপুরের অগম দত্ত, জীবন মাইতি। এই বৈঠকগুলিতে তিনি বাংলাদেশে একটি সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনেরপরিকল্পনা ঠিক করে দেন এবং আমাদের অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন। বাংলা দেশে প্রথম সোস্যালিস্ট নিউক্লিয়াস এইরূপে তিনিই সৃষ্টি করে দেন।[২১]

ড. অজিতকুমার ঘোষ বর্ণিত তথ্য উল্লেখ করে 'দেনাপাওনা' সম্পর্কে বলেন—

দেনা-পাওনা' উপন্যাসখানি ১৩২৭ আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র, ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র, ১৩২৭ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ হইল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট (ভাদ্র, ১৩৩০)।

শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিবার সময় এই উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, সেজন্য স্বাভাবিক কারণেই বিক্ষুব্ধ জনমানসের উত্তাপ এই উপন্যাসের কাহিনীকে স্পর্শ করিয়াছে। অবশ্য 'দেনা-পাওনা'র মূল সমস্যাটির সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনার কোন সম্পর্ক নাই, তবে মূল সমস্যাটির সঙ্গে যোগ

> রাখিয়া লেখক সমসাময়িক উত্তেজনার অগ্নিস্ফূলিঙ্গ দিয়া উপন্যাসের একটি উত্তপ্ত পার্শ্বসমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামের কোন রূপ অবশ্য শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহেন নাই, কিন্তু বিদেশী শাসনের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অত্যাচারী শক্তির শোষণের বিরুদ্ধেও যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বাস্তব চিত্রই তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাংলাদেশে সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তাধারা কিছুকাল পরেই একটি সুস্পষ্ট রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এই চিন্তাধারার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল! 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস রচিত হইবার সময় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় নাই সত্য, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনে তখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার উদয় হইয়াছিল এ অনুমান করা যাইতে পারে।[২২]

উনিশ শতকে বিদেশী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি অসন্তোষ ও স্বদেশী ভুস্বামীদের শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চেহারা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কখনো কখনো কৃষকদের বিক্ষোভ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে মিলেও গেছে। বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত কম বেশি এই দুটি প্রবণতাই প্রাধান্য পেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে রাজনৈতিক ফ্রেম বদলে গেলেও শ্রমিক অসন্তোষকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক পথ মাত্রা পেলো আরো কিছু পরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈন্যদের মাধ্যমে রাশিয়ার বিপ্লবের কথা প্রচারিত হল একটু একটু করে। দুয়ের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, তিনের দশকে প্রসার আর চারের দশকে পল্লবিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেলো। ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগলো কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক চিন্তা। কথাসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এই সময়টিকে ব্যাখ্যা করেন স্বস্তি মণ্ডল।—

> প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারাটা পালটাতে শুরু করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ-আদানপ্রদান নীতি, ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক এ শতকের গোড়াতেও অব্যাহত ছিল। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বিদেশীদ্রব্য বয়কট প্রভৃতি জাতীয় জীবনে উন্মাদনা লাগালেও সমবেত জনতা তাতে সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেনি। এছাড়া কংগ্রেসের ভূমিকা, নরম-চরমপন্থীর মতবিরোধ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়— সবাই দেশের বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধকালে দেশীয় নেতাদের স্বরাজ পাবার আকাঙ্ক্ষায় শাসকশক্তিকে সাহায্য করার চেষ্টায় বেশ কিছুদিন (এসময়

একমাত্র সন্ত্রাসবাদীদেরই সক্রিয় ভূমিকা ছিল) সবরকমের রাজনৈতিক আন্দোলন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রত্যাশিত স্বরাজ দেশবাসী করায়ত্ত করতে তো পারলই না বরং বিপন্ন ভারতবর্ষের চেহারাটা তাদের কাছে ক্রমেই প্রকট থেকে প্রকটতর হোলো। রাওলাট আইন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গান্ধীজীর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, চট-পাটকল ধর্মঘট, বোম্বাই-এ শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা সাধারণ দেশবাসীর নিস্পৃহ জীবনধারাকে ক্রমেই বিচলিত করে তুলল। এরই মধ্যে গান্ধীজীর ১৯২১-র অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, তার আগে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯, ১৩ ই এপ্রিল), ১৯২০ র এপ্রিল মাসে সারা দেশব্যাপী হরতাল পালন, খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২০) ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১); ১৯২৬ -এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯২৮, ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, কানপুর মামলা, ১৯৩০-এ অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ইত্যাদি ঘটনাগুলি যে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাতে জনজীবনে কমবেশি সাড়া জেগেছিল। এই পর্বের আরো দুটি বড়ো ঘটনা— ১৯১৭ তে রুশ বিপ্লব ও তার প্রভাব ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী 'অর্থনৈতিক মন্দা'র প্রভাবে ভারতের মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসিত দেশে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারায় বড়ো আঘাত হিসেবে দেখা দেয়। এসময় দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৯২০-তে ভারতের বাইরে কম্যুনিস্ট সংগঠন তৈরী, ১৯২৭-২৮ এ দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও সাম্যবাদী চেতনার প্রসার, সন্ত্রাসবাদী সহিংস বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ও তাদের সক্রিয় ভূমিকা সমস্ত পরিবেশকে এবং জীবনধারাকে করে তুলেছিল রাজনীতি সচেতন। এসময়ের সমাজস্রোত ও রাজনৈতিক স্রোতধারা একটাই প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। রাজনীতি সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষকে, তার সমাজকেও আজন্ম লালিতসংস্কারকে পাল্টাচ্ছিল। সামাজিক মানুষ ক্রমেই রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে। তিরিশ চল্লিশের দশকে জনগণের মনে গান্ধীজীর প্রভাব; তাঁর জীবনধারা ও কার্যবিধির ধারা জাতপাত নির্বিশেষে উচ্চবিত্ত,

মধ্যবিত্ত, অবহেলিত অতিসাধারণ জীবনে আমূল নাড়া দিয়েছিল। এই দুই দশকে (তিরিশ, চল্লিশ) সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে, বিশেষত গান্ধীভাবাদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে অনেক বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''ধাত্রীদেবতা''য় (১৯৩৯) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে গান্ধীবাদে উত্তরণের পর্বটিতে শিবনাথ সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার সংস্কারের সঙ্গে 'ভারত চিন্তা'র দ্বন্দ্বে সত্য পথটির সন্ধানী হয়েছে। ''গণদেবতা'' (১৯৩৪) ''পঞ্চগ্রামে'' (১৯৪৪) দেবু ঘোষ তার সমাজের অতি সাধারণ মানুষগুলিকে গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে ভাসাতে চেয়েছে। ঐ উপন্যাসেই প্রাচীন ন্যায়রত্নের নাতি বিশ্বনাথ ও তার সঙ্গীরা স্বপ্ন দেখে সংস্কারহীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের। তারাশঙ্করের রচনা ছাড়া সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ''কালোঘোড়া'' (১৩৫৩) সুবোধ ঘোষের ''তিলাঞ্জলী'' (১৯৪৪) তে সমকলীন রাজনৈতিক পরিবেশ গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ঔপন্যাসিকের রচনায় মন্বন্তর, অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধীমতাদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য, সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রভৃতি সমকালীন ঘটনা গুরুত্ব পেয়েছে।

কিন্তু এসব ঘটনা ও ঘটনাজাত তথ্যকে ঔপন্যাসিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ চরিত্রের ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব হিসেবে স্থাপন করেছেন। তারাশঙ্কর নিজে ১৯২১-এর অসহযোগ, তার আগে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে উৎসাহী ছিলেন। ১৯২৯-এ জেল এ গিয়ে ক্রমেই গান্ধীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের দেশকে যথার্থভাবে জানতে চেয়েছেন, দেশের কাজে, সমাজসেবায় মেতে ওঠেন। এই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর লেখকসত্তাকে সাহায্য করেছে। ''গণদেবতা'' প্রভৃতিতে তাঁর পরিচিত জীবন প্রতিবেশ, বিশেষত বীরভূম অঞ্চল তাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'রাজনৈতিক বোধ' যা রাজনৈতিক উপন্যাসের মূলকথা সেটা তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পায়নি। সামন্ততান্ত্রিক জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার সঙ্গে শোষণমুক্ত সমাজবাদ কখনোই মিলে মিশে যেতে পারে না। দেবু ঘোষ নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হলেও বারবার ফিরে গিয়েছে ন্যায়রত্নের আদর্শে, দ্বারিকা চৌধুরীর ভগ্নজীবন তাকে দুঃখ দিয়েছে। দেশের মানুষগুলো— অনিরুদ্ধকামার, পাতুডোম, গিরীশ ছুতোর এমন ভাবে জাতব্যবসা ছড়িয়ে, চণ্ডীমণ্ডপ তার পুরোনো ঐতিহ্য

হারাচ্ছে ভেবেই সে ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাকাতর হয়েছে। দেবু ঘোষ সমাজের পরিবর্তনকে ধরতে পেরেছে, কিন্তু মেনে নিতে পারেনি। আসলে এই সব মানসিক দ্বন্দ্ব স্বয়ং তারাশঙ্করের। সামন্ততান্ত্রিক জীবনের প্রতি মমতাই এর কারণ।

সতীনাথ এইখানেই অনন্য। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সক্রিয় ভূমিকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক তত্ত্বদর্শনের প্রতি উদার জ্ঞানপিপাসু পাঠক মন নিয়ে ধরতে পেরেছিলেন রাজনীতির প্রকৃত দ্বান্দ্বিক সত্যকে। বিরোধ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ভারতবর্ষের চেহারাটাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ছিলেন গভীর রাজনীতি সচেতন। রাজনীতির এই মর্মসত্য উপলব্ধি করেই গড়ে ওঠে যথার্থ রাজনৈতিক বোধ। এই রাজনৈতিকবোধকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ইতিহাস বোধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা সামাজিক অর্থনৈতিক চেতনার সঙ্গে অবিমিশ্র ভাবে জড়িত। সতীনাথ তাঁর উপন্যাসে, বিশেষত ''জাগরী'', ''ঢোড়াই চরিত মানস'' ও ''চিত্রগুপ্তের ফাইল'', এবং ''গণনায়ক'' ''আংটা বাংলা'' প্রভৃতি গল্পে রাজনৈতিক জীবনবোধকে গল্প উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন।[২৩]

বাংলা উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে একথা বলতেই হয়, রাজনৈতিক চেতনা যেমন বাংলা উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে তেমনি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পথকেও নিয়ন্ত্রণ করবার প্রচেষ্টা অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের ধারা মূলত প্রকট থেকেছে। স্বাধীনতার কিছু পূর্ব থেকেই বামপন্থী ভাবনা উপন্যাসে প্রবেশ করলেও পরবর্তীকালে তার প্রভাব ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়েছে, যার ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ্য করা গেল বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশক থেকে। সেই আলোচনা সানুপুঙ্খভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে আমরা করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নকশালবাড়ি আন্দোলন যখন উপন্যাসের বিষয় ও প্রসঙ্গ।

তৃতীয় অধ্যায় : উপন্যাসের শিল্পরূপ।

চতুর্থ অধ্যায় : ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি : সমর্থন, সমালোচনা, সহানুভূতি।

পঞ্চম অধ্যায় : চরিত্র সৃজনে বিশিষ্টতার অনুসন্ধান।

এবং উপসংহারে আমরা মূল অভিমুখে পৌছানোর প্রয়াস পেয়েছি।

তথ্যসূত্র

১. পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, পৃষ্ঠা ২০১

২. ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, দ্বিতীয় সং, ১৯৯০ জানুয়ারি, পৃ-১৪। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

৩. তদেব পৃ- ২৪

৪. বঙ্গদেশের কৃষক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়।

৫. তদেব।

৬. তদেব।

৭. তদেব।

৮. তদেব।

৯. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।। পৃ ৩৫-৩৬। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

১০. তদেব।৩৬-৩৭

১১. তদেব।৩৮-৩৯

১২. তদেব।৩৯-৪০

১৩. ভূমিকা, বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র, সংসদ

১৪. সজনীকান্ত দাশকে লেখা।। দেশ, সাহিত্য ১৩৭৭।। সূত্র-রবিজীবনী, ৬খণ্ড; প্রশান্তকুমার পাল, পৃ ১৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯

১৫. তদেব।১৫

১৬. সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস।। স্বস্তি মণ্ডল ।। পৃ ১৬-১৭।। রমা প্রকাশনী ৭৯/৪/২ ডি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫

১৭. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন।। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৩০, সূত্র শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার : অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ২১৭, দে'জ পাবলিশিং।।কলকাতা-৭০০০৭৩

১৮. সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস।। স্বস্তি মণ্ডল ।। পৃ ১৭।। রমা প্রকাশনী ৭৯/৪/২ ডি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫

১৯. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন।। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৬০-৬১, সূত্র শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার : অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ২০, দে'জ পাবলিশিং।।কলকাতা-৭০০০৭৩
২০. শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার : অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ২২০, দে'জ পাবলিশিং।।কলকাতা-৭০০০৭৩
২১. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন।। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃ ৭৬-৭৭, সূত্র শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার : অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ২২১, দে'জ পাবলিশিং।।কলকাতা-৭০০০৭৩
২২. শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার : অজিতকুমার ঘোষ, পৃ ২২১, দে'জ পাবলিশিং।।কলকাতা-৭০০০৭৩
২৩. সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস।। স্বস্তি মণ্ডল ।। পৃ ১৭-১৯।। রমা প্রকাশনী ৭৯/৪/২ ডি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫